বাবা এবং একটি চশমা

©

বারোমাসি প্রকাশনী

বাবা এবং একটি চশমা

সম্পাদনায় : জাবের রহমান
সহ-সম্পাদনায় : এস ইউ ফারুক

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :

লেখক ও প্রকাশকের যৌথ অনুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশবিশেষ ই-বুক বা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই ঘোষণা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বারোমাসি প্রকাশনী

প্রকাশক

মিঁয়া মোহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ ফয়সল

বাবা এবং একটি চশমা
সম্পাদনায় : জাবের রহমান
গ্রন্থস্বত্ব©সম্পাদক
প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪৩১ ,
জানুয়ারি, ২০২৫
রজব, ১৪৪৬

BABA EBONG EKTI CHOSMA
Editor: Jaber Rahman
Copyright © Editor
মুঠোফোন ০১৯৭১ ৬১ ১২ ১২ :
অক্ষরবিন্যাস : অলংকরণ ,
বারোমাসি

প্রচ্ছদ : অনিক শাহরিয়ার, সাহাদাত হোসেন
মুদ্রাক্ষরিক : সম্পাদক
ইলাস্ট্রেশন: সাখাওয়াত তমাল, জাবের রহমান, রাজীব চৌধুরী
মুদ্রণ : রিমা ট্রেড, ৪১২/বি, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : বারোমাসি, নাগড়া ফুটব্রীজ, নেত্রকোনা
বিক্রয়কেন্দ্র ১ : বারোমাসি, কদম খাঁ গলি, মিতালি রোড, ঝিগাতলা, ঢাকা
বিক্রয়কেন্দ্র ২ : বারোমাসি, বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ পার্ক সংলগ্ন, ঢাকা

বিনিময় মূল্য : চারশত আশি টাকা মাত্র **: US $ 6**

ISBN: 978-984-99551-8-4

ঘরে বসে, কম খরচে এবং বিভিন্ন প্যাকেজ ও বাহারি ছাড়ে যেকোনো প্রকাশনীর বই কিনতে যোগাযোগ :

www.facebook.com/baromashi
www.facebook.com/baromashiprokashoni

দেশবরেণ্য কার্টুনিস্ট এবং লেখক- এর কিছু কথা :

জাবের রহমান আমার প্রিয় এক তরুণ। সে নিয়মিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকে। আমাদের উন্মাদেরও সে নিয়মিত লেখক। ইতোমধ্যে তার একটি বই *মৃত্যু-কুয়াশা* প্রকাশিত হয়েছে, যা পাঠকনন্দিত হয়েছে বেশ।

এই গ্রন্থে তার খান সাতেক ভিন্ন স্বাদের গল্প রয়েছে। আশা করছি, পাঠক এগুলোও আগ্রহ ভরে গ্রহণ করবে। বলাই বাহুল্য, সে সব বিষয়ে লেখালেখিতে পারদর্শী।

এ গল্প-গ্রন্থের সম্পাদনার দায়িত্বেও সে। সম্পাদনা অতটা সহজসাধ্য কাজ নয়, অনেক খুঁটিনাটি জানতে হয়। সে এর আগে 'মৃত্যুপুরী!!!' গল্প-গ্রন্থও সম্পাদনা করেছে। প্রত্যাশা করছি, তার সম্পাদিত এ গল্প-গ্রন্থটিও পাঠকদের মনের খোরাক মেটাবে। তাকে বাংলা সাহিত্য ভুবনে স্বাগতম।

আহসান হাবীব
কার্টুনিস্ট, লেখক
উন্মাদ স্টল, বাংলা একাডেমি চত্বর
শুক্রবার, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

ভূমিকা

'বাবা এবং একটি চশমা' ২০২০ সালের দিকে উচ্ছ্বাস প্রকাশনী থেকে বের হওয়ার কথা ছিল। আমি এই প্রকাশনীর প্রকাশক হিসেবে কিছুদিন কাজ করেছি প্রিন্ট মিডিয়ায়। 'বাবা এবং একটি চশমা'-এর প্রচ্ছদও ঐ সময় করিয়ে রেখেছিলাম, তবে বইটি আলোর মুখ দেখেনি বিভিন্ন কারণে। গল্প-সঙ্কলন হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল এবং কয়েকজন নবীন লেখকের কাছ থেকে গল্পও সংগ্রহ করেছিলাম।

বইটি গড়ে ওঠেছে সমকালীন, হরর, স্পোর্টস, রম্য, থ্রিলার, অতিমাব ইত্যাদি জনরা নিয়ে। 'মিটুলা দ্য গ্রেট' ও 'উন্মাদীয়' দেশের অন্যতম রম্য-সম্রাট শ্রদ্ধেয় আহসান হাবীব স্যারের অসাধারণ স্যাটায়ার ম্যাগাজিন উন্মাদ পত্রিকায় প্রকাশিত। 'কিলিয়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব' হলো স্পোর্টস জনরা'র উপ-জনরা স্পোর্টস-রম্য জনরা। ২০১৮ বিশ্বকাপজয়ী এমবাপ্পেকে নিয়ে কাল্পনিক গল্পটি পাঠকের ভাল্লাগবে— এ প্রত্যাশা করছি; ২০২২ বিশ্বকাপ চলাকালীন সময়ে লেখা এ গল্পটি আমার নিজের লেখাগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রিয় একটি লেখা। 'বাবা এবং একটি চশমা' অনলাইন মিডিয়াতে (ফেসবুক) লেখা আমার সবচেয়ে প্রশংসাধন্য একটি লেখা।

''বাবা'' পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সবচেয়ে পবিত্র এবং প্রিয় একটি শব্দ। বাবা নিয়ে গড়ে ওঠা ছোট্ট গল্পটি পাঠকদের হৃদয় ছুঁয়ে যেতে বাধ্য! ২০১০ সালের ৩১ ডিসেম্বর আফতাবনগরে ক'জন বন্ধু মিলে প্রথমবারের মতো একদিনে সমাপ্ত হওয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিলাম (বোধহয় আফতাবনগরের রেকর্ড ঘাটলে দেখা যাবে, এখনও প্রথম হিসেবেই বহাল এ দুর্লভ রেকর্ডটি!)। আমার নেতৃত্বের দল *ফিল্ড ফাইটার্স* সেই টুর্নামেন্টের ফাইনালে জয় লাভ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সেই সত্য কাহিনির ছায়া অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে 'ঝিঁঝিঁ পোকা' গল্প।

নীলা মনি গোস্বামীর 'আলেয়ার সাপের খামার' অন্য ধাঁচের গা ছমছমে একটি হরর গল্প। সাপ নিয়ে লেখা গল্পগুলোর মধ্যে প্রথম সারির মধ্যে পড়বে এ গল্পটি! শরীফুল হাসান-এর গল্পটি অসাধারণ একখান ফ্যান্টাসি জনরার গল্প। গত বছরের শেষদিকে তাঁর বেশ কিছু চমৎকার অতিপ্রাকৃত গল্প 'চরকি'তে নাট্যরূপে সম্প্রচার হয়েছে, বইপড়ুয়া পাঠকদের কাছেও তাঁর এই গল্পটি আলো ছড়াবে নিশ্চিতভাবে। আরেকটি মুগ্ধ করার মতো গল্প হলো, সাদিয়া সিদ্দিকা'র প্রেম কিংবা বিচ্ছেদ গল্পখানা; অপূর্ব একটি গল্প বটে!

নোমান মোহাম্মদ মূলত একজন ক্রীড়া সাংবাদিক। ইউটিউবে তাঁর নট-আউট নোমান'র বিষম ভক্তই বলা যায় আমাকে। ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট এ ব্যক্তিত্বের মিসির আলী ও হিমু'র ফ্যান ফিকশন গল্পটি পাঠক হৃদয় বিলকুল ছুঁয়ে দেবে।

সূচিপত্র

বাবা এবং একটি চশমা..... ১১
বুড়িমা..... ১৫
উন্মাদীয়..... ১৭
ঝিঁঝিপোকা..... ২১
কিলিয়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব!! ২৭
ঝগড়ুটে!..... ৩১
মিটুলা দ্য গ্রেট..... ৩৫
সে ও পদ্মাবতী..... ৪০
ছাইদানি..... ৪৭
আলেয়ার সাপের খামার..... ৫৪
মন্ত্রীর পালানোর দিনে..... ৬০
সুরতী বানু..... ৬৫
হাংগার'স মিট..... ৬৭
তিন বন্ধুর গল্প গাঁথা..... ৭০
শপ-লিফট ৭৩
পেটুক ভূত..... ৮৩
প্রেম কিংবা বিচ্ছেদ..... ৮৯
আজব-অদ্ভুতুড়ে..... ৯২
মিসির আলী, হিমু এবং বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন..... ৯৫
রুপমের স্বপ্ন..... ১০৩
অকস্মাৎ একজন..... ১০৯
ভ্যাম্পায়ার..... ১২০
অপ্রত্যাশিত..... ১২৭
অধরা..... ১৩১
চা সমাচার..... ১৪৩
আলফা ইউনিয়ন..... ১৫৩
মুখোশ-মানব..... ১৬১

বাবা এবং একটি চশমা

বিশাল সাইজের চশমাটা পরে আছে মা। মাকে উদ্ভট, হাস্যকর দেখাচ্ছে। চশমাটার বামপাশের কাঁচটাতে বেশ ক'টা ফাটল ধরেছে। চশমাটা পরার পর মা বাচ্চা খুকির মতো হয়ে পড়ে; বেশ ক'বার ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি।

'মা, তুমি ভাঙা চশমাটা আবার পরেছ?'

'আ.. আসলে চোখে দেখছিলাম নারে ভালমতো।' মা'র সুন্দর, ফর্সা মুখটি লজ্জায় লালচে বর্ণ ধারণ করল।

'হ্যারে সিহাব, ঝর্না তোকে কল দিয়েছিল?'

'নাহ, মা।'

বুঝলাম প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য আপার কথা নিয়ে এলো মা।

মা যে চশমাটা পরেছে তা আমার মরহুম বাবার। বাবা আচমকাই আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন। অবশ্যি এটাও ঠিক, বাবার বয়েসের কোঠা ষাটের ঘরে পা রেখেছিল। তাতে কীই-বা আসে যায়। এমন কত শতবর্ষী বুড়োই তো একটা পা কবরে দিয়ে দিব্যি হেসেখেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমার বাবার কেনই বা ষাটের ঘরটাই হয়ে পড়ল কূপা-তে পরিপূর্ণ!

বাবা বিওএস নামক এক প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরি করত। বাবার এই ব্যাংক থেকে অবসর গ্রহণের ঠিক আগের পোস্ট ছিল সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। এই ব্যাংকের সুপ্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। ব্যাংকের কার্যক্রমের শুরুর পর্যায়ে এটির অফিসিয়ালরা বাবার অন্য ব্যাংকে পারফরম্যান্স দেখে তাদের ব্যাংকে যোগদান করার অফার দেন। বাবা যোগদান করেন এবং মাঠ পর্যায়ে কোম্পানির জন্য দৌড়-ঝাঁপসহ আনুষঙ্গিক সব কাজ করে এটির সাফল্যের নিয়ামক হিসেবে ২৪টি বছর অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন নিজেকে।

বাবা কোনো এক অলুক্ষণে রাতে হুট করে হার্ট-অ্যাটাকে মারা গিয়েছিল। এর আগে বাবার ছোট-খাটো দুটো অ্যাটাক হয়েছিল কেবল। যমদূত কী কারণে বাবার জান কবজের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন তা কেবল খোদ মহান রবই জানতেন! ভালো মানুষদের কি সৃষ্টিকর্তা এভাবেই চটজলদি নিয়ে যান?

মনে পড়ে বাবার একটি কথা যা আজও আমার কাছে অমীয় বাণীর মতো, 'শোন সিহাব, তোকে এ জীবনে অনেকেই কষ্ট দেবে। কিন্তু তুই কখনও কারো মনে কষ্ট দিবি না।'

অদ্ভুত হলেও সত্যি, তাঁর এ অমীয় বাণী শোনানোর সময়টা এখনও জ্বলজ্বল হয়ে রয়েছে স্মৃতিতে। তা ছিল ২০০৩, ইন্টার সম্পন্ন করার ঠিক পরের বছর ছিল সেটি।

বারোটা বছর ধরে তাঁর এই অমীয় বাণী আমার অবচেতনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এতটাই জায়গা দখল করে বসেছে, প্রতিনিয়তই চেষ্টা করেছি কোনো মানুষের মনে

বিন্দু পরিমাণ ক্লেশ যেন না পৌঁছোয়। মাঝে মাঝে ছিটকে পড়েছি নিয়ন্ত্রণের স্বচ্ছ লাইন থেকে। মানুষ আমি, ফেরেশতা তো নই!

মা ছাড়া আমাদের সঙ্গে বাবার একটা দূরত্বের দেয়াল তিলে তিলে কবে সৃষ্টি হয়েছিল বুঝতে পারিনি। এর প্রধান কারণ হয়তো তাঁর অতিরিক্ত খোদা-ভক্তিতে পেয়ে বসা। ছোটবেলায় যে বাবাকে দেখতাম আমাদের সঙ্গে বসে টিভি দেখছে, তা যেন সুদূরে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি হয়ে ছিল! যে বছর না ফেরার দেশে পাড়ি দিল বাবা সে বছরের দুটো ঘটনা এখনও স্মৃতির মণিকোঠায় জাজ্বল্যমান। অনার্সে পড়ার সময় মাসিক বেতন নিতে গিয়েছিলাম বাবার কাছে। বাবা গোঁ ধরে বসলেন, তিনিও যাবেন আমার সঙ্গে। অথচ আমার একদম ইচ্ছে করছিল না বাবাকে সঙ্গে নিতে। বাবা বোঝালেন, তিনি আমার ভার্সিটি যাবেন না, এমনিই তাঁর বাইরে যেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। বাবার সাথে এক রিক্সায় ঘুরে বেড়ানো, সেটিই আমার শেষ নস্টালজিয়া বাবার!

পরের যে স্মৃতি সেটি বাবার মৃত্যুর সেই রাতেরই। বাবা প্রায়ই মুঠোফোনে খোঁজ নিতেন, সে রাতেও বাবা কল দিল আমায় কোথায় আছি জানার জন্য। অথচ, আমি এলাকায়ই ছিলাম। ব্যাডমিন্টনের মৌসুম চলছিল, ব্যাডমিন্টন-কোর্টে খেলছিলাম। সেই রাতেই তিনটের দিকে বাবা শেষ নিঃশ্বাস ছেড়েছিলেন!

খুবই সচেতন একজন মানুষ ছিলেন। রাতে দরজা লক করার পরও দু'তিনবার করে চেক করতেন তিনি, এমনটাই ছিল তাঁর সবকিছুর ব্যাপারে সচেতনতা। কিন্তু, মৃত্যুর ঠিক ক'সপ্তা আগে বাসে চড়তে গিয়ে জানালার বাইরে হাত রাখার ফলে ছোট্ট দুর্ঘটনা ঘটে গেল। হাসপাতাল থেকে শুশ্রুষা করে নিয়ে আসলাম বাবাকে।

এখনও মৃতদেহ বহন করা অ্যাম্বুলেন্স এর সাইরেন এর আওয়াজ কানে এলে মন ছুটে চলে বাবার স্মৃতিতে, কারণ বাবাকে বয়ে বেড়ানো সেই অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে বাবার শবদেহের পাশে আমিই বসে ছিলাম! আঞ্জুমানে মুফিদুল এ বাবার শব নেয়ার আগে একটি গাড়ির পেছন সিটে বাবার পবিত্র মৃতদেহ এর মাথার পাশটা আমি বহন করছিলাম। কতবার ইচ্ছে হয়েছিল বাবার কপালে একটি নিষ্কলুষ চুমো এঁকে দিব, অথচ শত চেষ্টার পরও কেন পারিনি তা আজও বুঝে উঠতে পারিনি!

বাবা মারা যাওয়ার পর মা অপ্রকৃতিস্থের মতো হয়ে পড়ল। তাঁর নিউরোনের স্মৃতি থেকে প্রায়ই আমাদের দু'ভাই-বোনের নামগুলো যেন মুছেই যাচ্ছিল। মা'র পাগলামোটা চূড়ান্ত রূপ নিত যখন ভাঙ্গা চশমাটা হাতে পেত। তাঁর পাশে অদৃশ্য কাউকে ভেবে নিত সে, ভাঙ্গা চশমাটি অদৃশ্য তাকে পরানোর ভঙ্গি করে নিজেই পরে নিত এবং পাশের জনের (!) সঙ্গে দিব্যি শুরু করে দিত কথোপকথন।

আট মাসের সাইকিয়াট্রিস্ট ট্রিটমেন্টের পর মা প্রকৃতিস্থ হলো। সাইকিয়াট্রিস্ট ট্রিটমেন্টের মজার একটা দিক হলো, রোগী যত বেশি ঘুমের রাজ্যে বিচরণ করবে সুস্থতার আলোক মঞ্জিলে অনায়াসে পৌঁছুবে সে। সেই পুরনো সুস্থ, স্বাভাবিক মাকে

পাওয়ার পর আমরা দু'ভাই-বোন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। মা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে পড়লেও ভাঙ্গা চশমার মায়া ছাড়তে পারল না।

সে ও পদ্মাবতী

শরীফুল হাসান

'আমি যাব আর আসব,' বললাম আমি, 'আমি একা আপনাকে বাঁচাতে পারব না।'

বৃদ্ধের আশপাশে কেউ নেই। মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে প্রাচীন মানুষটি কাউকে না কাউকে আশা করছেন নিশ্চয়ই। স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত কোনো মুখ। কিন্তু সেই সৌভাগ্য তার হবে বলে মনে হচ্ছে না। আমি সদ্য পাশ করা ডাক্তার হিসেবে জীবনের প্রথম মৃত্যুপথযাত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটির ফর্সা, সাদা হাতখানা ধরে সাহস যোগানোর চেষ্টা করছি। বৃদ্ধের মুখটা কুঁচকে যাচ্ছে ব্যথায়। ঘোলাটে চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে, হয়তো পরিচিত কোনো মুখের ছায়া দেখতে পাচ্ছে আমার মাঝে। কিংবা অন্য কিছু। মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষের মাথার ভেতর কী চলে, সে কী ভাবে, তা বোধ হয় কোনোদিনও জানা হবে না।

আমার ডিউটি রাতে। সবগুলো কেবিন ঘুরে ঘুরে দেখেছি। থেমেছি এই বৃদ্ধের কেবিনে। আমি যে ক্লিনিকে কাজ করি, সেটা অভিজাতদের ক্লিনিক। কেবিনগুলো দামী, সাধারণত বড়লোকরা এই কেবিনগুলো ভাড়া করেন। আজ এই গভীর রাতে পুরো ক্লিনিক জুড়ে লোকজন যাওয়া-আসা করছে। তবে তিনতলার এ পাশটা ফাঁকা। কেবিনে ঢুকেই বুঝেছি, অশীতিপর লোকটির শেষ সময় চলে এসেছে। যেকোনো সময় কিছু একটা ঘটতে পারে। নার্সকে ডাকতে যাব, বুঝলাম বৃদ্ধ লোকটি শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরেছে আমার হাত। যেতে দিতে চাচ্ছেন না। কিন্তু এ সময় আমার সাহায্য লাগবে। অক্সিজেন দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি তখন যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন না। বরং হাতে ধরে আরো কাছে টেনে নিলেন। বুঝলাম, কিছু বলতে চাচ্ছেন।

'কিছু বলবেন?' কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে নিয়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তর দিতে চাইলেও পারলেন না। বরং কিছু থুতুর ছিটে এসে লাগল আমার গালে। বিরক্ত হলেও কিছু করার নেই। মৃত্যুপথযাত্রী একজন বৃদ্ধকে তো আর কিছু বলা যায় না। একপাশে টিস্যু পেপার ছিল। ছিঁড়ে নিয়ে মুখ মুছে নিলাম।

হাতটা এখনও ছাড়েননি। বরং আরো শক্ত করে চেপে ধরেছেন।

'কিছু বলবেন?' আবার জিজ্ঞেস করলাম, খুব কাছাকাছি গিয়ে। টিস্যু হাতে রেখেছি, সাবধানতা হিসেবে। তবে এবার সেরকম কিছু হলো না।

'আমাকে বাঁচাও!' ভদ্রলোক ফিসফিসিয়ে বললেন।

এরকম আকুতিভরা কথা শুনে বুকটা কেমন করে উঠল। ডিউটিতে যে নার্স আছে, ওকে ডাকা দরকার। কেবিনে একটা ফোন লাইন আছে, কিন্তু নামটাও ভুলে গেছি, খুঁজে পাব কী করে?

বয়স বেড়েছে বলে নিজেকে সামলাতে জানি, আর এই বয়সে কারো কথা শুনে উত্তেজিত হওয়াও ঠিক নয়। তাতে নিজেরই ক্ষতি। অনেকদিন ধরে কাউকে খুঁজছিলাম। আজ পেয়েছি।

‘বুড়ো মানুষ, কী বলতে কী বললাম, কিছু মনে কোরো না,’ বললাম আমি।

আলেয়ার সাপের খামার

নীলা মনি গোস্বামী

ছোটবেলা থেকেই আলেয়া একটু অন্যরকম। কোনো এক অজানা কারণে সাপের প্রতি রয়েছে তার অসীম মমতা। সাধারণ মানুষ যেখানে সাপ দেখলে ভয়ে পালায়, আলেয়া সেখানে সাপ ধরে বাড়িতে নিয়ে আসে। রান্নাঘরে মাছ-মাংস যা পায়, মুখে তুলে যত্ন করে খাইয়ে দেয়। কিছু না পেলে ইঁদুর, ব্যাঙ, টিকটিকি ধরে নিয়ে আসে সাপের জন্য। তারপর পেট ভর্তি করে খাইয়ে দিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দেয়। মানুষের আক্রোশের শিকার হওয়া আধমরা সাপকে যত্ন-আত্তি করে সুস্থ করে তোলে। দুষ্টু বাচ্চাদের সামনে সাপ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর ভয় দেখায়। সারাদিন বেদে পল্লীতে পড়ে থাকে, আরও কত কী!

মেয়ের এহেন কাজ-কর্মে তার বাবা মা একদম অতিষ্ঠ। তাকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য রীতিমতো পশুর মতো বেঁধে বেদম পেটানো হতো প্রতিদিন। খাবার দিতেন না ঠিকমতো। ঘরে আটকে রাখত। কিন্তু মেয়েটার শিক্ষা হতো না কিছুতেই। সে সুযোগ পেলেই ছুটে যেত বেদে পল্লীতে। কিংবা ঝোপ-ঝাড়ে ঘুরে বেড়াত সাপের সন্ধানে।

আমরা অবাক হয়ে যেতাম তার কাণ্ড দেখে। দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতাম, "আচ্ছা, তুই কি সাপ একটুও ভয় পাস না? কামড় দিলে তো মরে একেবারে ভূত হয়ে যাবি!"

হেসে ফেলত আলেয়া। তারপর মায়া-জড়ানো কোমল কণ্ঠে বলত, "আরে নাহ, ওরা খুব ভালো! কক্ষনো কারও ক্ষতি করে না। আর কামড় দেয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার।" কথাটা বলেই আলতো করে চুমো দিয়ে বসত হাতে ধরে রাখা কালচে সাপের মাথায়। আমরা শিউড়ে উঠতাম ভীষণভাবে।

এমনই ছিল আমাদের আলেয়া। আজ প্রায় দশ বছর পর তার সঙ্গে দেখা আমার। তল্পিতল্পা গুটিয়ে শহরে চলে গিয়েছিলাম অনেক আগেই। আজ এত বছর পর ফিরে এসেছি গ্রামের বাড়িটা বিক্রির জন্য।

আমাকে দেখেই কীভাবে যেন চিনে ফেলল আলেয়া। কাছে এসে বলল, "আরে! তুই ফিরোজ না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে? ঠিক চিনতে পারলাম না!"

"আরে, আমি আলেয়া। ছোটবেলায় সাপের গল্প শুনতে প্রতিদিন আমাদের বাড়িতে চলে আসতি, মনে নেই তোর?"

এক নিমিষে সব কথা মনে পড়ে গেল আমার। মনে এসে হানা দিল ছোটবেলার হাজারটা স্মৃতি। অনেক অনেক কথা হলো আলেয়ার সঙ্গে। একথা সেকথার পর সে আমাকে টেনে নিয়ে গেল তার বাড়িতে।

"দেখা যাক। কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে হয়তো। খোদা কখনও তার বান্দাদের খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। আমার বাচ্চাদেরও কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে!"

অপ্রত্যাশিত

রাকিব হাসান

আকাশি রঙের শাড়িটা জয়ার গায়ে মানিয়েছে বেশ। অবশ্য সব রঙেই জয়াকে সুন্দর লাগে। তবে আমার মনে হচ্ছে, ওকে আজ একটু বেশিই সুন্দর লাগছে। হতে পারে সে মন খারাপ করে আছে বলে। মন তো খারাপ করবেই তিন বছরের সম্পর্ক আমাদের। আমার চাকরি ছিল না বলে বিয়েটা করতে পারছিলাম না। এখন আমার মাসিক ইনকাম বেশ মোটা অংকের। জয়া এখন নাছোড়বান্দা। বিয়ে করতেই হবে।

'ঠিক আছে, দুই মাস সময় দাও। দুই মাস পরে বিয়ে করব।' প্রতিশ্রুতির সুরে বললাম।

'অভি, তুমি কি পাগল হয়েছ! আজ এবং এক্ষুনি বিয়ে করব!' জয়া কঠোর ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে।

আমি হতভম্ব। কঠিন জেদি মেয়ে সে। তিন বছরে ওকে আমি ভালো করে চিনেছি। শান্ত ভদ্র মেয়েটি সিদ্ধান্তের দিক দিয়ে বড্ড কঠোর। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মানে কোনোভাবে তা বদলাবে না। আমি শেষবারের মতো চেষ্টা করি।

'জয়া, প্লিজ আমাকে দুটো মাস দাও। মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার ব্যাপার আছে। কথা দিচ্ছি, একদিনও দেরি হবে না।'

'জয়া আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে, 'আমার সিদ্ধান্ত ফাইনাল। আজ এক্ষুনি বিয়ে করতে হবে। আজ নয়তো আর কোনোদিন নয়। তুমি আমাকে ভালো করেই জানো। আমি কী সিদ্ধান্ত নিতে পারি। কী করতে পারি!'

তার হাসি মাখা মুখের আড়ালে কঠিন একটা সত্তা লুকিয়ে রয়েছে। খুবই নিরেট তা। বাড়িতে ঝগড়া করে টিউশনি করে হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করছে ও। যদিও তার ফ্যামিলি উচ্চবিত্ত। বড্ড দ্বিধায় পড়ে যাই। কী করে সম্ভব এখন বিয়ে করা। এমন নয় যে, আমি জয়াকে ভালোবাসি না। ভালোবাসি। ভীষণ ভালোবাসি।

সমস্যাটা হচ্ছে আমার পেশা। জয়া জানে, আমি একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করি। আসলে তা নয়।

আমি একজন মেল এসকর্ট।

টাকার বিনিময়ে নিজের দেহ যৌবন সব বয়েসী নারীদের বিতরণ করি।

আমার বেশিরভাগ খদ্দের এই শহরের অভিজাত ফ্যামিলি'র মধ্য বয়স্ক নারী। এই পেশায় আমি ইচ্ছে করে আসিনি। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স কমপ্লিট করে চাকরির পিছু ছুটেছি। কোনো ফল হয়নি। মা-বাবা মরা এতিম ছেলে আমি। আত্মীয়-স্বজন এর কোনো খোঁজখবর নেই। একটা ইন্টারভিউ বোর্ডে এক নারী আমাকে প্রস্তাব দেয় নিজের দেহ বিক্রি করার। রাজি ছিলাম না প্রথমে। তারপরের দিন

জয়ার জন্মদিন ছিল। কোনোদিনই তো তাকে ভালো কিছু গিফট করতে পারিনি। বরং সে-ই আমাকে চালি যাচ্ছে। তাই কিছুক্ষণ ভেবে সিদ্ধান্ত নেই। আমি রাজি হয়ে যাই।

বেশ ভালো অংকের একটা টাকা পাই আমি। জয়া'র জন্য একটি শাড়ি কিনি। জয়াকে বলি চাকরি পেয়েছি এক মাসের এডভান্সও পেয়েছি। জয়া শাড়িটা বুকে জড়িয়ে ধরে